চুনতি সীরতুন্নবী (সা) মাহফিল
আধ্যাত্মিক প্রেক্ষাপট

ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী

সৃষ্টির শুরু থেকে পৃথিবীতে যত ধর্ম এসেছে সব ধর্মের প্রধান ও একমাত্র লক্ষ ছিল স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে সম্পর্ক নির্মাণ। যুগে যুগে মহাপুরুষগণ স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষে আজীবন সাধনা করেছেন। তবে স্রষ্টা ও সৃষ্টি তথা আল্লাহর সাথে বান্দার এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সঠিক পথ দেখাতে পেরেছে একমাত্র ইসলাম। প্রশ্ন হল, আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা কীভাবে সম্ভব? কীভাবে অসহায় ক্ষুদ্র বান্দা মহামহিম আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করতে পারে? হাদীসে কুদসীতে এর প্রক্রিয়াটি ব্যক্ত হয়েছে এভাবে:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، قال: إذا تقرب العبد إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً، وإذا تقرب إلي ذراعاً تقربت منه باعاً، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة

“আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আইহি ওয়াসাল্লাম তার রবের কাছ থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ পাক বলেন, বান্দা যখন আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ অগ্রসর হয় আমি তখন তার দিকে এক বাহু (পূর্ণদৈর্ঘ হাত) পরিণাম এগিয়ে যাই। সে যখন আমার দিকে এক বাহু পরিমাণ এগিয়ে আসে আমি তখন তার দিকে দুই বাহু পরিমাণ এগিয়ে যাই। বান্দা যখন আমার দিকে হেঁটে হেঁটে আসে আমি তখন তার দিকে দৌড়ের গতিতে এগিয়ে যাই।” (বুখারী : ৭৫৩৬, ৭৪০৫, ৭৫২৭; মুসলিম : ২৬৭৫)

এই হাদীস থেকে বুঝা যায়, বান্দা আল্লাহর দিকে অগ্রসর হওয়ার ধাপে ধাপে তিনি এগিয়ে এসে বান্দাকে বরণ করে নেন। হাদীসের বাচনভঙ্গি থেকে আরো বুঝা যায়, আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের দু'টি ধরন আছে। একটি হল, বান্দার চেষ্টা। এই চেষ্টা হয় ইবাদত বন্দেগী ও সৎভাবে জীবন যাপনের মাধ্যমে। আরেকটি ধরন হচ্ছে, স্বয়ং আল্লাহ বান্দাকে নিজের সান্নিধ্যে নিয়ে যাওয়া। বলা হয়েছে, বন্দা নিজ থেকে সামান্য চেষ্টা করলেই আল্লাহ বান্দাকে নিজের কাছে টেনে নেন। আল্লাহ যাদেরকে টেনে নেন, তারা আল্লাহর ওলীতে পরিণত হন।

মওলানা রূমী (র) একটি ছোট্ট উপমার সাহায্যে বিষয়টির চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহর পথে অগ্রসর হওয়ার সাধনা এবং আল্লাহ নিজে বান্দাকে টেনে নেওয়ার প্রক্রিয়াটিকে তিনি হরিণ শিকারের উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন। শিকারী প্রথমে অগ্রসর হয় হরিণের পদচিহ্ন দেখে দেখে। কিছুদূর যাওয়ার পর পদচিহ্ন নয়; বরং কস্তুরি নাভীর ভুবন মাতানো সুগন্ধি এসে শিকারীকে মাতোয়ারা করে তোলো। এখান থেকে সেই সুবাসই সাধককে প্রচন্ড আকর্ষণে নিয়ন্ত্রণহারা করে ফেলে। সে তখন শিকার নাগালে পাওয়ার জন্য পাগল উন্মাতাল হয়ে যায়। একে বলে উপরের আকর্ষণ। এতক্ষণ ছিল সাধনা। সাধনার পরের ধাপে এখন আকর্ষণ।

چندگاهش گام آهو درخور است
بعد از آن خود ناف آهو رهبرست

চন্দ গা'হশ গা'মে আ'হু দরখোর আস্ত
বাদ আযা'ন খোদ না'ফে আ'হু রাহবর আস্ত

যাত্রার সূচনায় হরিণের পদচিহ্ন হয় পথের দিশারী
তার পরে স্বয়ং কস্তুরি নাভী হয়ে যায় কান্ডারী। মসনবী শরীফ ২খ.ব-১৬৩

সেই আকর্ষণে, প্রেমের টানে সে তীব্র গতিতে ছুটে। এখানে সাধক যে পথ শত মনযিলে অতিক্রম করে প্রেমিক সে পথ পাড়ি দেয় এক মনযিলে।

رفتن یک منزلی بر بوی ناف
بهتر از صد منزل گام و طواف

রফতনে য়্যক মনযিলী বর বূয়ে না'ফ
বেহতর আয সদ মনযিলে গা'ম ও তওয়া'ফ

এক মনযিল পাড়ি দেয়া কস্তুরির সুবাস টানে
পদাতিক, চক্রাকার গমনের চেয়ে উত্তম শতগুণে। মসনবী শরীফ ২খ.ব-১৬৪

আরবিতে আকর্ষণকে বলা হয় জযব। জযব থেকে মজযুব শব্দ গঠিত। আধ্যাত্মিক পরিভাষায় মজযুব বলে ঐসব ওলী আল্লাহকে, যাদের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নেই। তাদের জীবনযাত্রা, আহার বিহার স্বাভাবিক মানুষের মতো নয়; তারা আল্লাহর ভালোবাসার আকর্ষণে উন্মাতাল। চুম্বক যেমন লৌহখন্ডকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে, তেমনি এরা আল্লাহর মহব্বতের উৎসমূলের দিকে আকর্ষিত থাকে। সুতরাং আল্লাহর ওলীদের দুটি পরিচয় সাধক ও মজযুব।

এদেশে ইসলামের প্রচার প্রসার হয়েছে আল্লাহর ওলীদের মাধ্যমে। সাহিত্যের ভাষায় সূফি দরবেশ। ইতিহাস বলে, বাংলার জমিনের এমন কোনো অলিগলি নেই, যেখানে কোনো না কোনো ওলী আল্লাহর পদার্পন হয় নি। ইসলামী জাহানে তাতারীদের আক্রমণে ইরান ও বাগদাদ ধ্বংস্তুপে পরিণত হলে অসংখ্য অগণিত ওলী দরবেশ, ইসলাম প্রচারক দলে দলে এদেশে চলে আসেন। তারা এখানে বিয়ে শাদী করে সাধারণ মানুষের সাথে মিশে যান। একাকী বা দল বেঁধে সাধারণ মানুষের কাছে আল্লাহ ও রাসূলের বাণী প্রচার ছিল তাদের জীবনের একমাত্র সাধনা। আল্লাহ ও রাসূল (সা) এর মহব্বতের বাতাবরণে মানুষকে ইসলামের সৌন্দর্যের দিকে আহ্বানের এই ধারা পরবর্তী যুগেও অব্যাহত থাকে। বর্তমান সময়েও কোনো কোনো হক্কানী দরবার এই ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

আমরা যে মাহফিল নিয়ে আলোচনা করছি তার প্রবর্তকও ছিলেন মজযুব ওলী। তিনি ছিলেন চুনতির শাহ ছাহেব নামে পরিচিত মওলানা হাফেয আহমদ (র)। বৃটিশ আমলে বাংলার মানুষের বিশেষ আকর্ষণ ছিল বার্মার প্রতি। বিশেষত চট্টগ্রামের লোকদের অর্থ-উপার্জনের উর্বর ক্ষেত্র ছিল বার্মা, আজকের মায়ানমার। হিন্দুস্তান হতে মাদ্রাসায় উচ্চতর লেখাপড়া শেষ করে মওলানা হাফেয আহমদ বার্মায় একটি মসজিদে ইমামতিতে নিয়োজিত হন। এক রমযানে শবে কদরের রাতে তিনি উর্ধ্বজগতের এমন আকর্ষণ বলয়ে পড়ে যান যেখান থেকে বের হওয়ার পথ তার ছিল না। এরপর থেকে তার জীবনের দীর্ঘ ৩৭ টি বছর কেটে যায় পাগল বেশে, পাগল পরিচয়ে বনে জঙ্গলে। চুনতি অভয়ারণ্যের বাঘ ভল্লুকের সঙ্গে ছিল তার অধিবাস।

মজযুবরা আল্লাহর পাগল। আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট থাকেন। চুনতির শাহ হাফেয আহমদ (র) এর বেলায় শুধু আকৃষ্ট বললে কম বলা হবে। সমুদ্রে যখন ঝড় উঠে, প্রবল ঘুর্ণাবর্ত তৈরি হয়। ঘুর্ণাবর্তের মাঝে যা কিছু পড়ে, চক্রাকারে নিজের মধ্যে তলিয়ে নেয়। চুনতির শাহ ছাহেবও প্রেমের এমন ঘুর্ণাবর্তে পড়েছিলেন। যা সত্যিই বিস্ময়কর। কারণ, আল্লাহর ওলীদের জীবনে 'সুকর' বা 'মত্ততা' আসে, আবার 'সাহও' বা 'চেতন' অবস্থা বহাল হয়। তখন তারা স্বাভাবিক জীবন যাপন করেন। কিন্তু দীর্ঘ ৩৭ বছর সুকর বা মত্ততার মধ্যে, ঘর সংসার, স্বাভাবিক জীবন থেকে বঞ্চিত হয়ে বদ্ধ পাগল বেশে কাটিয়ে দিয়েছেন এমন কোনো ওলী আল্লাহর জীবনকথা আমরা ইতিহাসে পড়িনি, এর আগে কারো কাছে শুনি নি। স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে আগে তিনি যখন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন তখন আমি চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় নিচের ক্লাসের ছাত্র। অস্বাভাবিক জীবনে শাহ ছাহেবের বনজঙ্গলে বিচরণের গল্প শুনেছি; কিন্তু নিজের চোখে দেখিনি; তবে তার মাথায় চুলের ঘন জটার কথা আমার মনে আছে। তার সাথে ব্যক্তিগত বহু স্মৃতিও মানসপটে এখনো অমলিন।

তার জীবনের এই স্তরটি বুঝতে হলে আধ্যাত্মিক সাধনার কয়েকটি মূল কথা সামনে রাখতে হবে। সাধনার পথে সাধকের প্রথম কাজ হয় 'সায়র মিনান্নাস ইলাল্লাহ। 'মানুষের লোকালয় ছেড়ে আল্লাহর দিকে পরিভ্রমণ। এ স্তরে সাধক, সমাজের সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ আল্লাহমুখি করে ফেলেন। আগেই বলেছি, এ কাজটি হয়ত

সাধক নিজেই করেন, যা অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টসাধ্য। আরেকটি ধরন হচ্ছে উর্ধ্বলোকের আকর্ষণ। এই আকর্ষণে পড়লে সাধক যে পথ একশ বছরে অতিক্রম করে মজযুব তা এক রাতে পাড়ি দেয়।

লোকালয় ছেড়ে আল্লাহমুখি হওয়ার কাজটি আক্ষরিক অর্থেও হতে পারে, কিংবা জনসংস্রব বর্জন করে 'খালওয়াত দর জাম' হিসেবে রূপক অর্থেও হতে পারে। অর্থাৎ সবার মাঝে বিচরণ; অথচ একমাত্র আল্লাহর সাথে মন। কা'বাঘরের তওয়াফ করতে অনেকের সাথেই ঘুরতে হয়; কিন্তু তওয়াফকারীর ধ্যানে ও জ্ঞানে থাকে কেবল একজন। তার জন্যই সে পাগলপারা, দেওয়ানা। দূরদূরান্ত পাড়ি দিয়ে তার সান্নিধ্য লাভের আশায় সে সফরের সব কষ্ট মাথায় পেতে নিয়েছে। সাধকের নামাযের অবস্থাও এর ব্যতিক্রম নয়। সবার সাথে জামাতে নামায পড়ছে। কিন্তু তার মন কি কারো সাথে আছে? দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দিয়ে নিজেই এক হাতের আঙ্গুল দিয়ে আরেক হাতে কড়া লাগিয়ে দাঁড়িয়েছে রাব্বুল আলামীনের সমীপে। এতক্ষণ খাওয়া-পরা, কথা বলা, মানুষের সাথে মেলামেশা জায়েয, এমনকি সওয়াবের কাজ ছিল; আল্লাহর সন্ধানী হওয়ার পর এখন সব বন্ধ, সম্পূর্ণ হারাম।

সাধনার প্রথম স্তরের পর শুরু হয় সাইর ফিল্লাহ (আল্লাহর মাঝে পরিভ্রমণ) অর্থাৎ আল্লাহর অসীম কুদরতের ভুবনে পরিভ্রমণ। এই স্তরটি ফানা ফিল্লাহর। ধ্যানে জ্ঞানে আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই থাকে না সাধকের সামনে। এখানে তার পশুত্বের স্বভাবগুলো বদলে যায়। আল্লাহর সুন্দর চরিত্রের ফোকাসে তার আচার ব্যবহারে স্বর্গীয় সৌন্দর্য ফুটে উঠে। ফানা ফিল্লাহর পরের স্তরটি বাকা বিল্লাহর। অর্থাৎ সাধক এই স্তরে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন না। বরং আল্লাহর শক্তিতে বলিয়ান হন। আল্লাহর চরিত্রের সুষমায় আলোকিত হন। এই স্তরেই তার নতুন পরিচয় খলিফাতুল্লাহ। পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি। আল্লাহ পাক প্রথম যখন ফেরেশতাদের সমাবেশ ডেকে ঘোষণা করেন, আমি পৃথিবীতে মানুষকে আমার প্রতিনিধি করে পাঠাতে চাই। তখন না বুঝে ফেরেশতারা আপত্তি জানিয়েছিল, আমরাই তোমার ইবাদত বন্দেগীর জন্য যথেষ্ট। পৃথিবীতে নতুন করে অরাজকতা সৃষ্টির জন্য কেন মানুষ সৃষ্টি করবে? সূফিতাত্ত্বিকরা বলেন, সৃষ্টিজগতে বিরাজিত ভালোবাসার জীবন দর্শন বুঝতে অক্ষমতাই ছিল ফেরেশেতাদের আপত্তির মূল কারণ।

মানুষ মাত্রই কোনো না কোনো মেধা ও প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু যারা জ্ঞান চর্চা করে তাদের মধ্যেই সেই সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ হয়। বাকীদের প্রতিভা ও মেধা অকেজো হয়ে অযত্ন অবহেলায় এক পর্যায়ে অপমৃত্যুর শিকার হয়। আল্লাহর খেলাফতের প্রতিভাও জন্মসূত্রে সব আদম সন্তানের মধ্যে সুপ্তভাবে গচ্ছিত। কিন্তু সাধনার পথে এই স্তর অতিক্রম করার পরই সেই প্রতিভার বিকাশ ঘটে ও আল্লাহর দুনিয়ায় মানুষকে হেদায়তের দায়িত্ব তারা পালন করেন। এই স্তরকে বলা হয় সায়র মিনাল্লাহ ইলান্নাস' অর্থাৎ 'আল্লাহ থেকে মানুষের দিকে পরিভ্রমণ।' এই পরিভ্রমণে মানুষকে আল্লাহ ও রাসূলের পথে আহ্বানের বিভিন্ন উপায় উপকরণ তারা কাজে লাগান। বস্তুত সাধনার পথে ফানাফিল্লাহর পরের স্তরে সাধকের মধ্যে খলিফা হওয়ার যোগ্যতার বিকাশ হয়।

চুনতির শাহ ছাহেব (র) ৩৭ বছরের দীর্ঘ পরিভ্রমণে কোন ভুবনে বিরাজ করছিলেন তার একটি প্রমাণ একটি উর্দু কবিতার প্রথম দু'লাইন। উন্মাতাল অবস্থায় বনে জঙ্গলে যখন ঘুরতেন তখন এই পংক্তিটিই ছিল তার জপমালা। তখন এর হাকিকত কেউ বুঝতে না পারলেও ১৯৭২ সাল থেকে মাহফিলে সীরাতুন্নবী প্রবর্তন করার পর অনেকে তার মর্মার্থ বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। শাহ সাহব কেবলার নিত্য জপনার সেই কবিতা পংক্তি ছিল :

هم مزار محمد پہ مر جاینگے
زندگے میں یہی کام کر جاینگے

'হাম মাযারে মুহাম্মদ পে মর জা'য়েঙ্গে
যিন্দেগী মে এহী কা'ম কর জা'য়েঙ্গে'

আমি মুহাম্মদ (সা) এর মাযারের 'পরে মরে যাব
জীবন ভরে এই একটি কাজ আমি করে যাব।

অর্থাৎ তিনি প্রেমের যে ভুবনে উন্মাতাল ছিলেন তা ছিল আল্লাহর রাসূলের প্রেমের ভুবন। সেই ভুবনের ঐশ্বর্য নিয়ে মানুষকে আহ্বান করেন সেই আকর্ষণে মাতোয়ারা হওয়ার জন্য। হাদীস শরীফে বর্ণিত-

عن أنس بن مالك ر ضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين

হযরত নবী করিম (সা) ইরশাদ করেছেন : তোমাদের কেউ ততক্ষণ মু'মিন হবে না যতক্ষণ আমি (রাসূল) তার কাছে তার নিজের জীবন, সন্তান-সন্ততি, পিতামাতা ও দুনিয়ার সকল মানুষের চাইতে অধিক প্রিয় না হব। (বুখারী : ১৫; মুসলিম : ৪৪) মুহাদ্দিসগণ সাধারণ মানুষকে বাঁচানোর জন্যে 'মু'মিন হবে না' কথাটির ব্যাখ্যা করেছেন 'পূর্ণাঙ্গ মু'মিন হবে না' অর্থে।

রাসূলে পাকের এই ভালোবাসার গুরুত্ব মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের জন্য এখন অনেক বেশি। বাংলাদেশে ও সারাবিশ্বে ইসলাম প্রতিষ্ঠার শ্লোগানে এমন তৎপরতা শুরু হয়েছে, যেখানে সন্ত্রাস ও উগ্রবাদকে জিহাদ নামে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। মূলত ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে ব্যাহত করার জন্যই এমন মতবাদের বিস্তার ঘটানো হচ্ছে। এরা নিজেদের অপছন্দ হলে শরীয়তের যে কোনো বিধানকে বেদাত নামে আখ্যায়িত করার উগ্রতা দেখাচ্ছে। রাসূলে পাকের তারিফ, প্রশংসা বা ভালোবাসার কথা বলা হলে তারা তাওহীদের পরিপন্থি বলে উড়িয়ে দেয়। এদেরকে বাহ্যত ইসলামী বেশভূষা ও সুন্নাহর কঠোর অনুসারী মনে হবে; কিন্তু নিজের মতবাদের বিরুদ্ধে হলে মানুষ হত্যার মতো পাপেও তাদের বুক কাঁপে না। এই মতবাদের উৎপত্তি হয়েছিল নজদের মাটি থেকে। তবে এর শিকড় প্রোথিত ইসলামের প্রথম যুগের খারেজী আন্দোলনে। অতি ধার্মিক খারেজীদের যুক্তি যতই শক্ত হোক তাদের আন্দোলন ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কত ভয়াবহ ছিল, তা ইতিহাসের ছাত্রদের অজানা নয়। ইদানিং মক্কা ও মদীনা শরীফের জুমার খোতবায় এই মতবাদের বিরুদ্ধে জোরালো বক্তব্য রাখা হচ্ছে; কিন্তু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাজনৈতিক মতবাদের রূপ নিয়েছে। আমাদের দেশেও ৬৩টি জেলায় একযোগে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার যে মহড়া দেখানো হয়েছিল তার উৎসেও আছে সেই উগ্র মতবাদ।

ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই চিন্তাগত বাড়াবাড়ি থেকে রক্ষার পথ, আল্লাহর রাসূলের মহব্বতের বাতাবরনে সবাইকে শামিল করা। উপমহাদেশে ওলী দরবেশ ও ওলামা মুজাহিদগণ আল্লাহর পথে জিহাদ করেছেন, সশস্ত্র লড়াইও করেছেন; কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তাদের তৎপরতা আল্লাহ ও রাসূলের মহব্বত এবং সেই সূত্রে মানুষের ভালোবাসার বাতাবরণের বাইরে যায় নি।

বর্তমানে আরেকটি উগ্র প্রবণতা হচ্ছে, আশেকে রাসূল দাবিদার কিছু লোকের মুখে রাসূল (সা) এর প্রশংসার খই ফুটে। অথচ বাস্তব জীবনে শরীয়তের বিধিবিধান ও সুন্নাহ অনুসরণের বালাই নেই। নবীজির পূর্ণাঙ্গ জীবনের সুন্নাত এবং ইসলামের বিধিবিধান রাষ্ট্রীয় জীবনে বাস্তবায়নের কথা বলা হলে, এরা বলে, এসব তো রাজনীতি। নবীজির ১০ বছরের মাদানী জীবন ও খোলাফায়ে রাশেদার ৩০ বছরের রাষ্ট্র পরিচালনার ইতিহাস বাদ দিলে ইসলামের আর কি থাকে, জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়। এদের সামনে ইসলাম ও নবী জীবন বলতে নবীজির শান-মান ও অলৌকিক ঘটনাবলীর বাইরে আর কিছু নেই।

আমার বিশ্বাস আলোচিত দুই বিপরীতমুখি উগ্র প্রবণতার মোকাবিলায় চুনতি সীরাতুন্নবী (সা) মাহফিল হেদায়তের আলো জ্বালিয়েছে। এ মাহফিলের আবেদন হল, শুধু নবীজির ভালোবাসার দাবি করলেই হবে না; নবীজির ভালোবাসা বুকে ধারণ করে নিজের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে নবীজির সমগ্র জীবনাদর্শের ছকে সাজানোর চেতনা জাগরুক থাকতে হবে। শুরুতেই সীরাতুন্নবী মাহফিলের এই দর্শন ও আবেদন বাস্তবে রূপায়নের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন একজন জ্ঞানতাপস। তিনি ছিলেন চুনতি মাদ্রাসার নাজেমে আলা আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ অসাধারণ প্রতিভাধর আলেমে দ্বীন হযরত মওলানা ফযলুল্লাহ (র)। তিনি মনের সবটুকু আবেগ মিশিয়ে ১৯দিন ব্যাপী সীরাত মাহফিলের জন্য

এমনভাবে বিষয় নির্বাচন ও বিন্যস্ত করেন, যাতে নবী করিম (সা) এর গোটা জীবনচিত্র ও ইসলামের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ের একটি ছক অঙ্কিত হয়।

আমাদের সমাজে ধর্মীয় মাহফিলের এক শ্রেণীর জনপ্রিয় বক্তা ছিলেন ও আছেন। তারা সারা বছর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই ওয়াজ করেন। নবী জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলী নিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করাই তাদের লক্ষ্য ছিল। চুনতি সীরাতুন্নবী (সা) মাহফিলে প্রত্যেক বক্তার জন্য আলাদা বিষয়বস্তু ঠিক করে দেয়ার পর এই রেওয়াজে পরিবর্তন আসে। বক্তারা পূর্ব নির্ধারিত বিষয়বস্তুর উপর লেখাপড়া ও গবেষণা করে বক্তৃতার নোট তৈরি করতে বাধ্য হন। এর ফলে বিষয়ভিত্তিক ওয়াজ নসিহতের যে ধারা শুরু হয়, তাকে আমাদের ধর্মীয় মাহফিল মজলিসের ইতিহাসে বিপ্লবী পদক্ষেপ হিসেবে মূল্যায়ন করতে হবে।

১৯৭২ সালে দেশজুড়ে ইসলামী চেতনা ও আলেম সমাজের দুর্দিনে আশার আলোকবর্তিকা হয়ে জ্বলে উঠেছিল ১ দিনের সীরাত মাহফিল। পরের বছরগুলোতে ৩ দিন, ৫ দিন, ৭ দিন, ১০ দিন, ১২ দিন, ১৫ দিন ও সর্বশেষ ১৯ দিনের এই সীরাতুন্নবী মাহফিলে ছোটবড় সবার দু'বেলা খাবারের ব্যয়বহুল আয়োজনের বিষয়টিও বিস্ময়কর। ৮০ বছর বয়সে ১৯৮৩ সালে শাহ ছাহেবের ইন্তিকালের পর কোনো কোনো ভক্ত ডোনার অপারগতা প্রকাশ করায় বিরাট মাহফিলের যেয়াফত চালু রাখায় সংকট দেখা দিল। মাহফিল ব্যবস্থাপনায় জড়িতরা দারুণভাবে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাদের একজন চুনতির মরহুম আহমদ সৈয়দ নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে আমাকে বলেন, মাহফিল শুরু হলে আমরা সংকট উত্তরণের নানা পথ নিয়ে ভাবছিলাম। খাবার এক বেলা করা বা শিশু-কিশোরদের বারণ করার কথাও বিবেচনায় আসল। কিন্তু গভীর রাত পর্যন্ত মিটিং সিদ্ধান্তহীনভাবে মুলতবী হয়ে গেল। রাতে বাসায় ফিরে স্বপ্নে দেখি, শাহ ছাহেব কেবলা আমাদের বলছেন, তোমরা মানুষকে সীরাত মাহফিলে আসার জন্য দাওয়াত দাও না কেন?

ফজরে উঠে ভাবছিলাম, মানুষ বেশি হচ্ছে, এ নিয়ে আমরা দুশ্চিন্তায়। অথচ স্বপ্নে যা বুঝলাম, তাতে আরো বেশি মানুষ ডাকার তাগাদা। ভোরবেলা মুলতবী বৈঠকে আবার বসলাম। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হল, একটি মাইক্রোবাস নিয়ে পাড়ায়, মহল্লায়, বাজারে গিয়ে মানুষকে সীরাত মাহফিলের দাওয়াত দিতে হবে। একটি মাইক্রোতে চেপে আমরা ক'জন গ্রামের বিভিন্ন হাটে বাজারে ও লোকালয়ে গিয়ে সীরাত মাহফিলের দাওয়াত দিলাম। আমাদের দাওয়াতে তরুণরাই বুঝি বেশি উৎসাহিত হল। মাহফিলে আসার উদ্দীপনায় তারা ভাবল, খালি হাতে কীভাবে যাই। মাহফিলের যেয়াফতের জন্য তারা গরু ও চালডাল যোগাড় করল। এভাবে চারদিকে অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে গেল এবং মাহফিলের অভাব বলতে আর কিছু থাকল না।

আরেকটি বিষয় সামনে রাখলে মাহফিলের আরেকটি সৌন্দর্য ফুঠে উঠবে। শাহ ছাহেব কেবলা তার কোনো খলিফা বা গদিনশীন রেখে যান নি। তিনি কাউকে মুরিদও করেন নি। কখনো মাইকের সামনে দু'কথা বলেন নি, নামাযে ইমামতি করেন নি বা লোকদের নিয়ে শেষ মোনাজাতও কোনো দিন করেন নি। এরপরও এতবড় মাহফিল এতো সুন্দরভাবে পরিচালিত হওয়া এবং সারা দেশের নানা চিন্তা ও ঘরানার শীর্ষ আলেমরা মাহফিলে অংশগ্রহণ করা–এর মধ্যে নিশ্চয়ই রহস্য আছে। সাতকানিয়া উপজেলার গারাঙ্গিয়ার ছোট হুযুর ও গারাঙ্গিয়া মাদ্রাসার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মওলানা আব্দুর রশীদ (র) সীরাতুন্নবী মাহফিলে একবার সভাপতির ভাষণে বলেন, পীর ছাহেবরা মুরিদের কলবে তাওয়াজ্জুহ দেন। তাতে তাদের দিলের আঁধারি দূর হয়ে যায়, হেদায়তের বাতি জ্বলে ওঠে। কিন্তু চুনতির শাহ ছাহেব তাওয়াজ্জুহ দেন না, মুরিদ করেন না, সবক দেন না। এরপরও মানুষ তার কাছ থেকে হেদায়তের আলো পায়। কেননা, তিনি হলেন 'শামসুল আরেফীন' মারেফাতের সূর্য। সূর্য উদিত হলে এমনিতেই অন্ধকার দূর হয়ে যায়। আলাদা বাতি জ্বেলে আলোর ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হয় না।

আল্লামা ইকবালের শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া নামক দুটি কবিতার খ্যাতি জগত জোড়া। শেকওয়ায় তিনি মুসলিম উম্মাহর সমস্যাগুলো তুলে ধরেন এবং তার জবাব চান আল্লাহর কাছে অভিযোগ আকারে। শোনা যায়, তার এতবড় স্পর্ধার জন্য কেউ কেউ তাকে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেছেন বলেও মন্তব্য করেছিল প্রথমে। পরে জওয়াবে

শেকওয়া লিখে তিনি শেকওয়ায় উত্থাপিত অভিযোগগুলোর জবাব আল্লাহর পক্ষ হতে দেন, যা গোটা মুসলিম উম্মাহর কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয় এবং ইকবাল এ যুগে ইসলামের ভাষ্যকারের মর্যাদায় অভিষিক্ত হন। জওয়াবে শেকওয়ার উপসংহারে চিন্তার ঐশ্বর্য ও কবিতার শিল্প দিয়ে ইকবাল বলেছেন, উম্মতের যাবতীয় সমস্যার সমাধান হবে, যদি রাসূলে পাক (সা) এর ভালোবাসার বন্ধনে তার সুন্নাহর ঝান্ডার নিচে সংঘবদ্ধ হওয়া যায়। ইকবাল বলেন, পৃথিবীতে একটি বিপ্লব চাই। এ বিপ্লবের জন্য একটি শক্তির দরকার। সেই শক্তি হতে হবে প্রেমের।

قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے
কুওয়তে ইশক সে হার পস্ত কু বা'লা কর দে
প্রেমের শক্তিতে উঁচুনিচু সব ওলট পালট করে দাও,

কিন্তু এই প্রেমের শক্তি কোথায় মিলবে? পরের ছত্রে তিনি সেই উৎসের কথা বলছেন এভাবে:

دہر کو اسمِ محمد سے اجالا کر دے

দাহর কূ ইসমে মুহাম্মদ সে উজালা কর দে
জগতটাকে মুহাম্মদের নামে আলোকিত করে দাও।

জওয়াবে শেকওয়ার শেষ চরণ দু'টির মধ্যেও ইকবালের এই জীবন দর্শনের অনুরণন লক্ষণীয়। ইকবালের ভাষায় আল্লাহ পাক বলছেন-

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

কী মুহাম্মদ সে ওয়াফা তো নে তো হাম তেরে হ্যাঁ
ইয়ে জাহাঁ চীজ হে কেয়া লৌহ ও কলম তেরে হ্যাঁ

মুহাম্মদের সাথে বিশ্বস্ততা রেখেছ তো আমি তোমার হয়ে যাব,
এ জগত তো তুচ্ছ, লৌহ কলমও তখন তোমার হয়ে যাবে।

(আল্লামা ইকবাল, জওয়াবে শেকওয়া)

Chuhati.com
Pioneer in village based website